নাগার্জুনের দর্শন

একটি সামগ্রিক পরিক্রমা

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়

কথামুখ
অরিন্দম চক্রবর্তী

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

সূচি

মুখবন্ধ	৯
মহাকরুণাঘন শূন্যতার কথামুখ/ অরিন্দম চক্রবর্তী	১৭
ভূমিকা	২১
প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব	৪৭
নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্ব	৬৪
নাগার্জুনের দৃষ্টিতে কালের স্বরূপ বিশ্লেষণ	৯৬
প্রমাণের স্বরূপ অন্বেষণে নাগার্জুন	১২০
নাগার্জুনের ভাষাদর্শন	১৪৮
নাগার্জুনের নৈতিকভাবনা	১৭৩
নাগার্জুনের রাষ্ট্রচিন্তা	১৯৯
নাগার্জুনের বুদ্ধবন্দনা	২২১
উপসংহার	২৩৮
নির্ঘণ্ট	২৫৭

মুখবন্ধ

বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে পড়তে আসা যে কোন ছাত্রছাত্রীকেই প্রথম শূন্যতার ধারণায় হোঁচট খেতে হয়। 'শূন্য' কথাটির সাধারণ অর্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় যখন বলা হয় 'সর্বং শূন্যং শূন্যম্' তখন ছাত্রছাত্রীর মনে এই মতবাদের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মনে হতে থাকে এই মতটি কি আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে মতে সব কিছুকেই শূন্য বলা হয়; কারণ শূন্য কথাটির দ্বারা অভাব বা অনস্তিত্ব বোঝানো হয়। অথচ জগতে তো বহু জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় যেগুলির সবই আমাদর গৃহীত প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া সব জিনিসকে শূন্য বলে মনে করলে, বুদ্ধদেব বা তাঁর উপদেশাবলীর কি দশা হবে? সমগ্র বৌদ্ধ দর্শন বুদ্ধদেব ও তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েই আছে। সবই যদি শূন্য বলে অভিহিত হয় তাহলে সমগ্র বৌদ্ধদর্শনের কী পরিণতি হবে? শূন্যতাকে কেন্দ্র করে এই ধরনের নানা প্রশ্ন প্রথম পাঠার্থীর মনে দেখা দেয় এবং এই প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই শাস্ত্রে কোন অগ্রসর হতে ইচ্ছে করে না। এই সমস্যা যে কেবল ছাত্রছাত্রীদের মনেই জাগে তা নয়, যেকোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এই প্রশ্ন জাগে। বার বার এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতাই আমাকে নাগার্জুনের দর্শন নিয়ে একটা ছোট বই লেখার উদ্বুদ্ধ করে। ইংরাজি ভাষায় নাগার্জুনের উপর নানা প্রমাণ্য লেখা প্রবন্ধ বা গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরনের কোন বই আমার নজরে আসেনি। আমাদের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যারা বাংলাভাষাতে পড়াশুনা করতে স্বচ্ছন্দ, তাদের কাছে নাগার্জুনের দর্শনকে সহজ করে তোলার জন্য একটু চেষ্টা করা দরকার। সেই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে আমার এই বইয়ের অবতারণা। তবে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে এটিকে কখনই নাগার্জুনের দর্শন বিষয়ক শেষ কথা বলা যায়

না— এটিতে নাগার্জুনের সমগ্র দর্শনের একটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। 'শূন্যতা' বলতে কী বোঝায়, নাগার্জুন শূন্যতা তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েও কীভাবে তাঁর দর্শনে প্রমাণের উপস্থাপনা করা হয়েছে, কীভাবে নৈতিকতার প্রতিপাদন করা সম্ভব, এমনকি একজন রাজার পক্ষে কী করে যথার্থভাবে রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব, সে প্রসঙ্গে নাগার্জুনের মতামত কী— এই সব বিষয়গুলির প্রতি সাধারণ ছাত্রছাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। সেইদিক থেকে এই গ্রন্থটিকে একটা প্রারম্ভ (introductory) গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

ভারতীয় দর্শনগ্রন্থের সূচনায় যে চারটি বিষয় বা অনুবন্ধ চতুষ্টয় উল্লিখিত হয়ে থাকে— বিষয়, উদ্দেশ্য, সম্বন্ধ, অধিকারী— সেই অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের পরিভাষায় বলতে পারি যে এই গ্রন্থের বিষয় হল নাগার্জুনের দর্শনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা। উদ্দেশ্য হল, শূন্যতা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলি আছে তা দূর করে শূন্যতার প্রকৃত অর্থ তুলে ধরা এবং সেই অর্থ অবলম্বন করে দর্শনের অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা। এই আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তিবিজ্ঞানের অন্যতম এই যুক্তিবিদের দর্শন ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নাগার্জুনের মূল গ্রন্থপাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে এই গ্রন্থটিকে একটি সোপান হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই গ্রন্থের অধিকারী হল মূলত ছাত্রছাত্রী এবং সেই সমস্ত মানুষ যাঁদের বৌদ্ধ দর্শন জানার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ থাকলেও নানা কারণে মূল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা হয়ে ওঠেনি। এই সমস্ত মানুষদের কাছে যদি এই গ্রন্থটি নাগার্জুনের মূল গ্রন্থের কিছুটা আস্বাদ এনে দিতে পারে তাহলেই আমার এই লেখা সার্থক হয়ে উঠবে।

আমার এই ছোট্ট বইটি রচনার পিছনে অনেকেরই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান আছে। প্রথমেই যাদের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় তারা হল আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। বিশেষ করে এম.ফিল স্তরের। বেশ কিছু বছর ধরে আমি এম.ফিল স্তরে নাগার্জুনের দর্শনের প্রমাণতত্ত্ব, নৈতিক ভাবনা, রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি কোনো না কোনো বিষয় পাঠ্যরূপে পড়িয়েছিলাম। প্রত্যেকবারই দেখেছি ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে। তাদের সেই প্রশ্নের অনেকগুলিই আমাকে ভাবিয়েছে

অরিন্দম চক্রবর্তী

মহাকরুণাঘন শূন্যতার কথামুখ

সংযুক্তনিকায়ের পঞ্চদশ ভাগের এক অতিসংক্ষিপ্ত বুদ্ধবচনসংগ্রহের নাম: অস্‌সু (অশ্রু) সুত্ত। চোখের জলের বিষয়ে তথাগতের ''পন্‌হো''—মানে প্রশ্ন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সূত্রের ভাষায় বলা যায় ''অথ অশ্রু জিজ্ঞাসা''। মানুষের কান্নার বিষয়ে দার্শনিক প্রশ্ন!

শ্রাবস্তীতে নিবাস কালে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ভিক্ষুদের ডেকে বললেন—''তোমাদের কি মনে হয় ভিক্ষুগণ, কোনটি পরিমাণে বেশী? অনাদিকাল ধরে সংসারচক্রে ঘুরতে ঘুরতে জন্মের পর জন্ম এই চিরদীর্ঘ সময় জুড়ে তোমরা অ-প্রিয় সংযোগ আর প্রিয়বিয়োগ-বশতঃ যে কান্না কেঁদেছ, যে অশ্রুধারা বইয়ে এসেছ, সেই জলসঞ্চয় নাকি পৃথিবীর চারটি মহাসাগরের লবণাক্ত জলসঞ্চয়?''

ভিক্ষুরা সমস্বরে বললেন: ''যতদূর পর্যন্ত আমরা বুদ্ধের দেশনা (শিক্ষা) বুঝতে পেরেছি, জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভবচক্রে ঘুরতে ঘুরতে আমরা যে চোখের জল ফেলেছি, তা চারটি সমুদ্রের জলসমষ্টি থেকে বেশী।''

ভারতবর্ষে প্রাক্-বুদ্ধযুগের প্রাচীনতম তর্কযুক্তি নির্ভর সাংখ্যদর্শন থেকে শুরু করে একেবারে সত্যজিৎ রায়ের মানবদরদী রূপক ছায়াছবি ''গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'' পর্যন্ত সমস্ত মনন ও কলার মূলে আছে এই ক্রন্দনকর্দম থেকে মানুষ তথা সর্বজীব (''সত্ত্ব'')-কে উদ্ধার করবার—দুঃখত্রাণ করবার 'মহাকরুণা'-রূপ ইচ্ছা। নাগার্জুনের শূন্যতার দর্শনেরও মূলে রয়েছে এই করুণার প্রেরণা। জগৎটা তিনরকমের দুঃখে অনাদিকাল থেকে ডুবে রয়েছে।